بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৩৫। www.motaher21.net

وَقَضَىٰ رَبُّكَ
" আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন। "

" Your Lord has decreed."

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে (বিরক্তিসূচক শব্দ) 'উঃ' বলো না এবং তাদেরকে ভৎর্সনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা।

[১] আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে قضي এটা শব্দের অর্থ أمر বা নির্দেশ দিয়েছেন। মুজাহিদ বলেন, এখানে قضي অর্থ وصي বা অসিয়ত করেছেন। [ইবন কাসীর] অন্য কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এখানে قضي শব্দটি قضاء شرعي বা শরীআতগত ফয়সালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [সা'দী]

[২] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরয করেছেন। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা নিজের শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছেঃ "আমার শোকর কর এবং পিতা-মাতার ও" [সূরা লুকমানঃ ১৪]।

এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতামাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলঃ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেনঃ সময় হলে সালাত পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলঃ এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয় ? তিনি বললেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। [মুসলিমঃ ৮৫]

তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে পিতা-মাতার আনুগত্যও সেবা যত্ন করার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, যেমনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা , এর হেফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও " [তিরমিযীঃ ১৯০১] । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ "আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত" [তিরমিযীঃ ১৮৯৯]। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সে ব্যক্তির নাক ধুলিমলিন হোক, তারপর ধুলিমলিন হোক , তারপর ধুলিমলিন হোক ", সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কে ? রাসূল বললেনঃ "যে পিতা-মাতার একজন বা উভয়কে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেল তারপর জান্নাতে যেতে পারল না"। [মুসলিমঃ ২৫৫১]

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন, কোন আমল মহান আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়? রাসূল বললেনঃ সময় মত সালাত আদায় করা। তিনি বললেন, তারপর কোন কাজ? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। তিনি বললেন, তারপর ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। [বুখারীঃ ৫৯৭০]

তবে সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েয নয়। সে হিসেবে কোন কোন বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই , বরং জায়েযও নয়। কিন্তু পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলিম হওয়া জরুরী নয়, আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেনঃ আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন "তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর। " [মুসলিমঃ ১০০৩]

কাফের পিতা-মাতা সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেনঃ "আমি মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে ওরা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে মেনো না। [সূরা আল-আনকাবুতঃ ৮]

আল্লাহ আরেক জায়গায় বলেনঃ "তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদভাবে"। [সূরা লুকমানঃ ১৫]

অর্থাৎ যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলাবাহুল্য, আয়াতে মারুফ' বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়ন মূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে। ইসলাম পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের এমনই গুরুত্ব দিয়েছে যে, যদি জিহাদ ফরযে আইন না হয়, ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকে, তখন পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্যে জিহাদে যোগদান করা জায়েয নেই। আবদুল্লাহ ইবনে আমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিহাদের যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার পিতা মাতা কি জীবিত? সে বললঃ হ্যা। রাসূল বললেন, "তাহলে তুমি তাদের খেদমতে জিহাদ করো"। [মুসলিমঃ ২৫৪৯]

অনুরূপভাবে পিতামাতার মৃত্যুর পরে তাদের বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করারও নির্দেশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "কোন লোকের জন্য সবচেয়ে উত্তম নেক কাজ হলো, পিতার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। " [মুসলিমঃ ২৫৫২]

[৩] পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানদের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তদুপরি বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনা ও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়া ও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। আল্লাহ তা'আলা এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদপেক্ষা বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তারা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশও কামনা বাসনা তোমার জন্যে কোরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহমমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাদের পূর্বঋণ শোধ করা কর্তব্য। أُف বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যদ্দারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ। এরপর বলা হয়েছে, وَّلاَتَنهَرهُمَا এখানে نهر শব্দের অর্থ ধমক দেয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

[৪] প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমন সব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতা-মাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নাম স্বরে কথা বলতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ....)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে সকলকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এ বিশ্বাস কর না যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ ইবাদত পাওয়ার হকদার আছে, অথবা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কেউ ইবাদত পাওয়ার হকদার আছে। বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল ইবাদত পাওয়ার হকদার, তাঁর জন্যই সকল ইবাদত করতে হবে। যদি এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত না করে, অন্য কোন মা'বূদের ইবাদত কর তাহলে অবশ্যই নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হবে। দুনিয়াতে তোমাকে তোমার বাতিল মা'বূদেরা কোন উপকার করবে না, আখিরাতেও তারা কোন উপকার করতে পারবে না, তাদেরকে নিয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। এই শিরক ও তার পরিণতি সম্পর্কে সূরা নিসায় আলোচনা করা হয়েছে।

(وَقَضٰي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا....)

এখানে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের প্রত্যেক স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের হকের (একমাত্র তাঁর ইবাদতের নির্দেশের) সাথে সাথে মানুষের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সৎ ব্যবহার পাওয়ার হকদার তথা পিতা-মাতা তাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক কর না; এবং পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর" (সূরা নিসা ৪:৩৬)

এরূপ কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে যেখানে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনকি যদি পিতা-মাতা মুশরিকও হয় তাহলেও তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে, তবে আল্লাহর আনুগত্য বহির্ভূত কোন কাজ বা তাঁর সাথে শিরক করার নির্দেশ দিলে তাদের কথা মানা যাবে না, কিন্তু বিআদবীও করা যাবে না, সুন্দরপন্থায় বর্জন করতে হবে। হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর ইবাদতের পর পিতা-মাতার হকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন কবীরাহ গুনাহ হল আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। (সহীহ বুখারী হা: ৬৮৭০, সহীহ মুসলিম হা: ৮৭)

বিশেষ করে তারা উভয়ে বা একজন বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে, তাদের খেদমত করতে হবে এবং তাদের কথায় বা আচরণে কষ্ট পেয়ে মুখ দিয়ে উফ শব্দটিও উচ্চারণ করবে না, এমন কি ধমকস্বরেও কথা বলবে না। এসময় তারা খেদমতের বেশি মুখাপেক্ষী থাকে, কারণ নিজেরা স্বয়ংসম্পন্নভাবে চলতে ফিরতে পারে না, ঔষধ-ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়, কাপড় নষ্ট করে ফেলে ইত্যাদি। তাই এ সময়টির কথা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এবং সর্বদা তাদের সাথে উত্তম ভাষায় সম্মান দিয়ে কথা-বার্তা বলতে হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষায় পিতা-মাতা সন্তানের জান্নাতে ও জাহান্নামে যাওয়ার মাধ্যম। কেউ যদি তাদের সেবা করে সন্তুষ্ট করতে পারে তাহলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, আর সে জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে আর যদি কেউ তাদেরকে কষ্ট দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলাও কষ্ট পান, এ জন্য তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। হাদীসে এসেছে

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা মিম্বরে আরোহণ করে তিনবার বললেন, আমীন, আমীন, আমীন। তখন সাহাবারা এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন । তিনি বললেন: আমার নিকট জিবরীল এসেছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! ঐ ব্যক্তির নাক ধূলোমলিন হোক যার নিকট আমার নাম স্মরণ করার পর সে

আমার ওপর দরূদ পাঠ করে না। বলুন আমীন। আমি বললাম, আমীন। অতঃপর সে বলল: ঐ ব্যক্তির নাক ধূলোমলিন হোক যার কাছে রমযান মাস এসেছে আবার চলেও গেছে কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হয়নি। বলুন আমীন। আমি বললাম, আমীন। অতঃপর সে আবার বলল: ঐ ব্যক্তির নাক ধূলোমলিন হোক যে, তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে তার জীবদ্দশায় পেয়েছে কিন্তু সে জান্নাতে যেতে পারল না। বলুন আমীন। আমি বললাম, আমীন। (তিরমিযী-৩৫৪৫, যাওয়ায়েদুল মুসনাদ হা: ৭৪৪৪, সহীহ)

(جَنَاحَ الذُّلِّ) 'নম্রতার বাহু' অর্থাৎ পাখি যখন তার বাচ্চাদেরকে নিজ করুণার ছায়ায় রাখতে চায়, তখন তাদের জন্য নিজের ডানাকে নত করে দেয়। অর্থাৎ তুমিও তোমার পিতা-মাতার সাথে ঐরূপ উত্তম এবং করুণাসিক্ত আচরণ কর। আর তাদের ঐরূপ সেবাযত্ন কর যেরূপ সেবা-যত্ন তারা তোমার শিশুকালে করেছিল। আর তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে বল:

(رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا)

'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।'

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)

'হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসেব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করে দাও।' (সূরা ইবরাহীম ১৪:৪১)

তবে যদি পিতা-মাতা বিধর্মী হয় তাহলে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। যেমনিভাবে ইবরাহীম (عليه السلام) তাঁর পিতার অবস্থা জানার পর তার জন্য দু'আ করা থেকে বিরত থাকলেন। (তাওবা ৯:১০৩) তবে ভাল ব্যবহার করতে হবে এবং সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্যের ইবাদত করা যাবে না।
২. পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। তাদের অবাধ্য হওয়া যাবে না।
৩. পিতা-মাতা বিধর্মী হলে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না, তবে ভাল আচরণ করতে হবে।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর [১] এবং বল, 'হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন [২]। '

[১] পাখি যেভাবে তাঁর সন্তান্দেরকে লালন পালন করার সময় তাঁর দু' ডানা নত করে আগলে রাখে তেমনি পিতা-মাতাকে আগলে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পাখি যখন উড়ে তখন ডানা মেলে ধরে তারপর যখন অবতরণ করতে চায় তখন ডানা গুটিয়ে নেয়, তেমনি পিতামাতার প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাখি যেভাবে নিচে নামার জন্য গুটিয়ে নিয়ে নিজেকে নিচে নামায় তেমনি তুমি নিজেকে গর্ব-অহংকার মুক্ত হয়ে পিতা-মাতার সাথে ব্যবহার করবে। [ফাতহুল কাদীর] উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন এর অর্থ, তাদের নির্দেশ মান্য করা এবং তাদের কাংখিত কোন বস্তু দিতে নিষেধ না করা। [ফাতহুল কাদীর]

[২] এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার ষোল আনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করবে যে, তিনি যেন করুণাবশতঃ তাদের সব মুশকিল আসান

করেন এবং কষ্ট দূর করেন। বৃদ্ধ অবস্থাও মৃত্যুর সময় তাদেরকে রহমত করেন। [ইবন কাসীর] সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ও দোআর মাধ্যমে সর্বদা পিতা-মাতার খেদমত করা যায়। পিতা-মাতা মুসলিম হলেই তাদের জন্য রহমতের দো'আ করতে হবে, কিন্তু মুসলিম না হলে তাদের জীবদ্দশায় পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকাও ঈমানের তওফীক লাভের জন্য করা যাবে। মৃত্যুর পর তাদের জন্যে রহমতের দো'আ করা জায়েয নেই।

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا

তোমাদের প্রতিপালক খুব ভাল করেই জানেন তোমাদের অন্তরে কী আছে। তোমরা যদি সৎকর্মশীল হও, তবে যারা বার বার তাঁর দিকে ফিরে আসে তিনি তো তাদের প্রতি পরম ক্ষমাশীল।

২৫ নং আয়াতের তাফসীর:

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, মানুষ অন্তরে যা কিছু গোপন করে সেগুলো তিনি অধিক জানেন। কোন কাজ প্রকাশ্যে করা হোক, অপ্রকাশ্যে করা হোক, আলোতে করা হোক আর অন্ধকারে করা হোক, মানুষ দেখুক আর না-ই দেখুক, সব খবর তিনি রাখেন। তাঁর জ্ঞান থেকে কোন কিছু লুকানোর সুযোগ নেই।

অন্যত্র তিনি বলেন:

(إِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط إِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও জমিনের যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় পরিজ্ঞাত। অন্তরে যা কিছু রয়েছে সে সম্বন্ধেও তিনি সবকিছু অবগত।" (সূরা ফাতির ৩৫:৩৮)

اوابِيْنَ শব্দের অর্থ: অভিমুখী হওয়া, ফিরে আসা।

কেউ কেউ বলেন, اوابِيْنَ বলা ঐ সমস্ত সৎ লোকদেরকে যারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত পড়ে।

কারো মতে, যারা চাশ্তের সালাত আদায় করে তাদেরকেই اوابِيْنَ বলা হয়।

অন্য একদল বলেন, যারা প্রত্যেক পাপ কার্যের পর তাওবা করে তাড়াতাড়ি মঙ্গলের দিকে ফিরে আসে এবং নির্জনে নিজেদের পাপের কথা স্মরণ করে আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে اوابِيْنَ বলা হয়।

উবায়েদ (রহঃ) বলেন যে, اوابِيْنَ হচ্ছে তারাই যারা বারবারই কোন মজলিস হতে ওঠার পর এই দু'আ পাঠ করে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَصَبْتُ فِيْ مَجْلِسِيْ هَذَا

হে আল্লাহ এ মজলিসে যা ভুল করেছি তা ক্ষমা করে দাও।

ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন, সঠিক উক্তি হচ্ছে, যারা গুণাহ হতে তাওবা করে অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যা ঘৃণ্য তা ছেড়ে দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কাজ করে তারাই হল اوابِيْنَ । (ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

এখান থেকেই চাশতের সালাতকে আওয়াবিনের সালাত বলা হয়। কারণ এ সময় মু'মিনরা আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে আসে, যে সময় সাধারণত সকলে কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকে। (সহীহ মুসলিম হা: ৭৪৮)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

(১) আল্লাহ তা'আলা মানুষের বাহ্যিক জিনিস দেখে বিচার করেন না বরং তার নিয়তের প্রতি লক্ষ্য করেন।
(২) মানুষের অন্তরের খবরও আল্লাহ তা'আলা রাখেন, তিনি অন্তরযামী।

وَءَاتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

আর আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও, আর অপব্যয়ে অপচয় করো না।

পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সাথে সৎ আচরণ করার নির্দেশ দেয়ার পর আত্মীয়-স্বজন, ফকীর-মিসকীনদের ও পথিকদের হক দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। তাদের হক হল তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, তাদেরকে ধমক না দেয়া এবং বিপদে পড়লে সহযোগিতা করা। আর ধনীদের সম্পদে তারা যাকাত পাওয়ার যে হকদার সে হক দিয়ে দেয়া। আত্মীয়-স্বজনরা যদি ওয়ারিশ হয় তাহলে তাদের প্রাপ্য সম্পদ দিয়ে দেয়া এবং মারা গেলে তাদের জানাযায় শরীক হওয়া। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অতঃপর যারা নিকটবর্তী ও তাদের পরে যারা নিকটবর্তী। (মুসতাদরাক: ৪২১৯, শুআবুল ঈমান হা: ৭৮৪৪)

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "যে ব্যক্তি তার রিযিক ও আয়ু বৃদ্ধি করতে চায় সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" (সহীহ বুখারী হা: ৫৯৮৫, ৫৯৮৬, সহীহ মুসলিম হা: ২৫৫৭)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। আর যে অপচয় করে তাকে শয়তানের ভাই হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অপচয় হল প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা বা নষ্ট করা। সেটা যেকোন ক্ষেত্রে হতে পারে। সম্পদ অপচয় হতে পারে, সময় অপচয় হতে পারে, জ্ঞান-বুদ্ধির অপচয় হতে পারে, ইত্যাদি। মু'মিনরা কখনো কিছু অপচয় করে না, তাদের সম্পদ অতিরিক্ত থাকলে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে, সময় অতিরিক্ত থাকলে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন থাকে। সুতরাং কেবল শয়তানের অনুসারীরাই অপচয় করতে পারে, অন্য কেউ নয়।

অর্থাৎ আর্থিক সামর্থ্য না থাকার কারণে (যা দূরীভূত হওয়ার এবং রুযীর প্রসারতার তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আশা রাখ) যদি তোমাকে গরীব আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং অভাবী ব্যক্তিদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় অর্থাৎ কিছু দিতে না পারার ওজর পেশ করতে হয় তাহলে নরম ও কোমল কন্ঠে পেশ করবে। কর্কশ ও অভদ্রতার সাথে বলো না। কেননা তাদের সাথে ভালভাবে কথা বলা এটাও একটা সাদকাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ أَذًى ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ)

"ভাল কথা বলা এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দানের চেয়ে উত্তম যে দানের পরে কষ্ট দেয়া হয়। আর আল্লাহ ধনী এবং ধৈর্যশীল।" (সূরা বাকারাহ ২:২৬৩) সুতরাং গরীব-মিসকিনরা কোন কিছু চাইতে আসলে যথাসম্ভব কিছু দেয়ার চেষ্টা করবে, দিতে না পারলে তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করবে না, বরং সুন্দর ভাষায় ও ভদ্রতার সাথে বিদায় দেবে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

(১) হক্কদারদের হক্ক যথাযথভাবে আদায় করে দিতে হবে।
(২) অপচয় ও কৃপণতা করা যাবে না।

(৩) মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করাও একটি নেকীর কাজ।
(৪) গরীব-মিসকিনদেরকে ধমক দিয়ে বিদায় দেয়া উচিত নয়, বরং যদি কিছু না দিতে পারো নরম ভাষায় বিদায় দেবে।

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

[১] تَبْذِيْرٌ এর মূল ধাতু হল بِذْرٌ (বীজ)। যেমন যমীনে বীজ ফেলার সময় এটা লক্ষ্য করা হয় না যে, তা যথাস্থানে পড়ছে, না যেখানে সেখানে পড়ে যাচ্ছে। বরং চাষী বীজ ফেলেই চলে যায়। تَبْذِيْرٌ (অপব্যয়ে)ও এটাই হয়। মানুষ তার মাল বীজ ফেলার মত ছড়াতে থাকে এবং ব্যয় করার ব্যাপারে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করে। কেউ কেউ বলেছেন, تَبْذِيْر হল, অবৈধ কার্যকলাপে ব্যয় করা, যদিও তা সামান্য হয়। আমাদের জানা মতে উভয় অবস্থাই تَبْذِيْر (অপব্যয়)এর পর্যায়ভুক্ত। আর এটা এত বড় জঘন্য কাজ যে, এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শয়তানের সাথে রয়েছে পূর্ণ সাদৃশ্য। অথচ শয়তানের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকা মানুষের জন্য ওয়াজেব; যদি তা (শয়তানের) কোন একটি অভ্যাসেও হয়। এ ছাড়া শয়তানকে كَفُوْرٌ (অতিশয় অকৃতজ্ঞ) বলে তার মত না হতে আরো তাকীদ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তুমি শয়তানের সাদৃশ্য গ্রহণ কর, তাহলে (তুমি তার ভাই হবে এবং) তুমিও তার মত كَفُوْرٌ (অকৃতজ্ঞ) বিবেচিত হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর)

ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করেনা, কৃপনতাও করেনা, আর তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী" [সূরা আল-ফুরকান: ৬৭]

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অপচয় হচ্ছে, অন্যায় পথে ব্যয় করা। মুজাহিদ বলেন, যদি কোন লোক তার সমস্ত সম্পত্তি হক পথে ব্যয় করে তারপরও সেটা অপচয় হবে না। আর যদি অন্যায়ভাবে এক মুদ পরিমাণও ব্যয় করে। তবুও সেটা অপচয় হবে। কাতাদাহ বলেন, অপচয় হচ্ছে আল্লাহর অবাধ্যতা, অন্যায় ও ফাসাদ-সৃষ্টিতে ব্যয় করা। [ইবন কাসীর]

সুরা: বনী ইসরাঈল
আয়াত নং :-28

وَ اِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا

(পাচ) যদি তাদের থেকে (অর্থাৎ অভাবী, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফির) তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এজন্য যে, এখনো তুমি প্রত্যাশিত রহমতের সন্ধান করে ফিরছো, তাহলে তাদেরকে নরম জবাব দাও। ২৮

তাফসীর :

টিকা:২৮) এ তিনটি ধারার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিজের উপার্জন ও ধন-দৌলত শুধুমাত্র নিজের জন্যই নির্ধারিত করে নেবে না বরং ন্যায়সঙ্গতভাবে ও ভারসাম্য সহকারে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর নিজের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য অভাবী লোকদের অধিকার আদায় করবে। সমাজ জীবনে সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং অন্যের অধিকার জানা ও তা আদায় করার প্রবণতা সক্রিয় ও সঞ্চারিত থাকবে। প্রত্যেক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের সাহায্যকারী এবং প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের আশপাশের অভাবী মানুষদের সাহায্যকারী হবে। একজন মুসাফির যে জনপদেই যাবে নিজেকে অতিথি বৎসল লোকদের মধ্যেই দেখতে পাবে। সমাজে অধিকারের ধারণা এত বেশী ব্যাপক হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাদের মধ্যে

অবস্থান করে নিজের ব্যক্তি-সত্তা ও ধন-সম্পদের ওপর তাদের সবার অধিকার অনুভব করবে। তাদের খিদমত করার সময় এ ধারণা নিয়েই খিদমত করবে যে, সে তাদের অধিকার আদায় করছে, তাদেরকে অনুগ্রহ পাশে আবদ্ধ করছে না। কারোর খিদমত করতে অক্ষম হলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহর বান্দাদের খিদমত করার যোগ্যতা লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাগুলোও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নৈতিকতার শিক্ষাই ছিল না বরং পরবর্তী সময়ে মদীনা তাইয়েবার সমাজে ও রাষ্ট্রে এগুলোর ভিত্তিতেই ওয়াজিব ও নফল সাদকার বিধানসমূহ প্রদত্ত হয়, অসিয়ত, মীরাস ও ওয়াকফের পদ্ধতি নির্ধারিত হয়, এতিমের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, প্রত্যেক জনবসতির ওপর মুসাফিরের কমপক্ষে তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং এ সঙ্গে সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা কার্যত এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হয় যার ফলে সমগ্র সামাজিক পরিবেশে দানশীলতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা মনোভাব সঞ্চারিত হয়ে যায়। এমনকি লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইনগত অধিকারসমূহ দেয়া ছাড়াও আইনের জোরে যেসব নৈতিক অধিকার চাওয়া ও প্রদান করা যায় না সেগুলো ও উপলব্ধি ও আদায় করতে থাকে।

সুরা: বনী ইসরাঈল
আয়াত নং :-29

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا

(ছয়) নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে।২৯

তাফসীর :

টিকা:২৯) "হাত বাঁধা" একটি রূপককথা। কৃপণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর "হাত খোলা ছেড়ে দেয়া'র মানে হচ্ছে, বাজে খরচ করা। ৪র্থ ধারার সাথে ৬ষ্ঠ ধারাটির এ বাক্যোংশটি মিলিয়ে পড়লে এর পরিষ্কার অর্থ এই মনে হয় যে, লোকদের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য হতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে ফেলে। এর বিপরীত পক্ষে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবে না আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতিরও শিকার হবে না। অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, ফাসেকী ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনেও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন-সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এভাবে নিজেদের ধন-দৌলত খরচ করে তারা শয়তানের ভাই।

এ ধারাগুলোও নিছক নৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত হেদায়াত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং এদিকে পরিষ্কার ইঙ্গিত করছে যে, একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজকে নৈতিক অনুশীলন, সামষ্টিক চাপ প্রয়োগ ও আইনগত বাধা-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে অযথা অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রাখা উচিত। এ কারণেই পরবর্তীকালে মদীনা রাষ্ট্রে বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতিতে এ উভয় ধারা নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত, অপব্যয় ও বিলাসিতার বহু নীতি প্রথাকে আইনগতভাবে হারাম করা হয়। দ্বিতীয়ত, কৌশল অবলম্বন করে অযথা অর্থ ব্যয়ের পথ বন্ধ করা হয়। তৃতীয়ত, সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে এমন বহু রসম-রেওয়াজের বিলোপ সাধন করা হয় যেগুলোতে অপব্যয় করা হতো। তারপর রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা বলে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা বিধান জারী করে সুস্পষ্ট অপব্যয়ের ক্ষেত্রে বাধা ইখতিয়ার দেয়া হয়। এভাবে যাকাত ও সাদকার বিধানের মাধ্যমে কৃপণতার শক্তিতে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় এবং লোকেরা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে অর্থের আবর্তনের পথ বন্ধ করে দেবে এ সম্ভাবনা ও নির্মূল করে দেয়া হয়। এসব কৌশল অবলম্বন করার সাথে সাথে সমাজে এমন একটি সাধারণ জনমত সৃষ্টি করা হয়, যা দানশীলতা ও অপব্যয়ের মধ্যকার পার্থক্য সঠিকভাবে জানতো এবং কৃপণতা ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয়ের মধ্যে ভালভাবেই ফারাক করতে পারতো। এ জনমত কৃপণদেরকে লাঞ্ছিত করে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষাকারীদেরকে মর্যাদাশালী করে, অপব্যয়কারীদের নিন্দা করে এবং দানশীলদেরকে সমগ্র সমাজের খোশবুদার ফুল হিসেবে

কদর করে। সে সময়ের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের প্রভাব আজও মুসলিম সমাজে রয়েছে। আজও দুনিয়ার সব দেশেই মুসলমানরা কৃপণ ও সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে এবং দানশীলরা আজও তাদের চোখে সম্মানার্হ ও মর্যাদা সম্পন্ন।

"হাত বাঁধা" কৃপণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর "হাত খোলা ছেড়ে দেয়া"র মানে হচ্ছে, বাজে খরচ করা। [ইবন কাসীর] আয়াতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তার মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যেও বিপদ ডেকে না আনে। যখনই তুমি তোমার সামর্থ্যের বাইরে হাত প্রশস্ত করবে, তখনই তুমি খরচ করার কিছু না পেয়ে বসে পড়বে। তখন তুমি 'হাসীর' হবে। হাসীর বলা হয় সে বাহনকে যে দুর্বল ও অপারগতার কারণে চলতে অপারগ হয়ে গেছে। [ইবনকাসীর] হাসীর এর আরেক অর্থ তিরস্কৃত হওয়া। [ফাতহুল কাদীর] মোটকথা: কৃপণতা যেমন খারাপ গুণ, অপচয় ও তেমনি খারাপ গুণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কৃপণ ও খরচকারীর উদাহরণ হচ্ছে সে দু'জন লোকের মত। যাদের উপর লোহার দু'টি বর্ম রয়েছে। যা তার দু'স্তন থেকে কন্ঠাস্থি পর্যন্ত ব্যাপ্ত। খরচকারী যখনই খরচ করে তখনই তা প্রশস্ত হতে থাকে এমনকি তার পায়ের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত প্রলম্বিত হয় এবং তার পদ চিহ্ন মিটিয়ে দেয়। আর কৃপণ সে যখনই কোন খরচ করতে চায় তখনি তা সে বর্মের এক কড়া আরেক কড়ার সাথে লেগে যায়, সে যতই সেটাকে প্রশস্ত করতে চায় তা আর প্রশস্ত হয় না।" [বুখারী: ২৯১৭]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিদিন সকালবেলা দু'জন ফেরেশতা নাযিল হয়। তাদের একজন বলতে থাকে, আল্লাহ! আপনি খরচকারীকে বাকী থাকার মত সম্পদ দান করুন, অপর জন বলে, আল্লাহ্! আপনি কৃপনকে নিঃশেষ করে দিন।" (বুখারী: ১৪৪২: মুসলিম: ১০১০)

পূর্বের আয়াতে গরীব-দুঃখীদেরকে দান করার সামর্থ্য না থাকলে ওজর পেশ করার ও বিদায় দেয়ার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ব্যয় করার নীতি ও আদব শিক্ষা দিচ্ছেন। ব্যয় করার ক্ষেত্রে এমন কৃপণতা করবে না যে, নিজ ও পরিবারের ভরণ-পোষণ ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে ইতস্ততবোধ কর। আবার এমন মুক্ত হস্তে দান ও ব্যয় করো না যে, নিজের সামর্থের দিকে লক্ষ্য থাকে না। বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। কারণ কৃপণতা করলে তিরষ্কৃত ও নিন্দার পাত্র হবে আর অপব্যয় করলে অনুতপ্ত, ক্ষতিগ্রস্থ ও শয়তানের ভাই বলে গণ্য হবে। তাই ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। যেমন

দয়াময় আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন:

(وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا)

"এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।" (সূরা ফুরকান ২৫:৬৭)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, রিযিক দেয়ার মালিক একমাত্র তিনি, তিনি যাকে খুশি রিযিক প্রসারিত করে দেন আবার যাকে খুশি হ্রাস করে দেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ক্ষমতাবান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ص وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ)

"আর আল্লাহ (মানুষের রিযিক) কমান ও বাড়ান এবং তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।" (সূরা বাকারাহ ২:২৪৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ)

"আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন।" (রা'দ ১৩:২৬) তবে যিনি যতটুকু রিযিকের উপযুক্ত তাকে ততটুকুই রিযিক দিয়ে থাকেন। অন্যথায় জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি হবে। (সূরা শুরা ৪২:২৭)

অতএব রিযিক দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাই তাঁর কাছে রিযিক চাইতে হবে। রিযিক শুধু ধন-সম্পদের ভিতর সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবন থেকে মরণ পর্যন্ত যা কিছু রয়েছে সবই রিযিকের শামিল।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কৃপণতা ও সাধ্যাতীত ব্যয় উভয়টা নিন্দনীয় ও বর্জণীয়।
২. মানুষ নিজের সামর্থ্যানুযায়ী ব্যয় করবে, তবে কৃপণতা করবে না।
৩. রিযিক দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, অন্য কেউ নয়।

সুরা: বনী ইসরাঈল
আয়াত নং :-30

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا

তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আবার যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং তাদেরকে দেখছেন।৩০

তাফসীর :

টিকা:৩০) অর্থাৎ মহান আল্লাহ নিজের বান্দাদের মধ্যে রিযিক কমবেশী করার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রেখেছেন তার উপযোগিতা বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই রিযিক বন্টনের যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে কৃত্রিম মানবিক কৌশলের মাধ্যমে তার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা উচিত। প্রাকৃতিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে পরিবর্তিত করা অথবা এ অসাম্যকে প্রাকৃতিক সীমার চৌহদ্দী পার করিয়ে বে-ইনসাফীর সীমানায় পৌঁছিয়ে দেয়া উভয়টিই সমান ভুল। একটি সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবস্থান আল্লাহ নির্ধারিত রিযিক বন্টন পদ্ধতির নিকটতরই হয়ে থাকে।

এ বাক্যে প্রাকৃতিক আইনের যে নিয়মটির দিকে পথনির্দেশ করা হয়েছিল তার কারণে মদীনার সংস্কার কর্মসূচিতে এ ধারণাটি আদতে কোন ঠাঁই করে নিতে পারেনি যে, রিযিক ও রিযিকের উপায়-উপকরণগুলোর মধ্যে পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আসলে এমন কোন অকল্যাণকর বিষয় নয়, যাকে বিলুপ্ত করা এবং একটি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা কোন পর্যায়ে কাংখিত হতে পারে। পক্ষান্তরে সৎকর্মশীলতা ও সদাচারের ভিত্তিতে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ কায়েম করার জন্য মদীনা তাইয়েবায় এক বিশেষ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সে কর্মপদ্ধতি ছিল এই যে, আল্লাহর প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য করে রেখেছে তাকে আসল প্রাকৃতিক অবস্থায় অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ওপরে প্রদত্ত পথনির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও কর্মবিধানসমূহ এমনভাবে সংশোধন করে দিতে হবে, যার ফলে জীবিকার পার্থক্য ও ব্যবধান কোন জুলুম ও বে-ইনসাফির বাহনে পরিণত হবার পরিবর্তে এমন অসংখ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও তামাদ্দুনিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বাহনে পরিণত হবে, যে জন্য মূলত বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা তাঁর বান্দাদের মধ্যে এ পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছেন।

সুতরাং কাউকে রিযক বেশী ও কম দেয়ার মধ্যে তাঁর বিরাট হেকমত রয়েছে। তিনি জানেন কাকে বেশী দিলে সে আরো বেশী পেতে চাইবে বা গর্বে সীমালঙ্গন করবে: অথবা কুফরীর কারণ হবে। আবার কাকে বেশী না দিলে তার জন্য তা কুফরীর কারণ হবে। আর কাকে কম দিলেও সে ধৈর্যশীল প্রমাণিত হবে। আর কাকে সম্পদ কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবে। সুতরাং যিনি সবকিছুর খবর রাখেন তিনি প্রত্যেককে তার জন্য যা উপযোগী সে অনুসারে রিযক দান করেন। দেখুন, [ইবন কাসীর] অথবা, আয়াতের আল্লাহর নাম দু'টোর উদ্দেশ্য, তিনি জানেন যা তারা গোপন রাখে এবং যা প্রকাশ করে। তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি বান্দাদের অবস্থান সম্পর্কে অধিক অবহিত, তাদের রিযক বন্টনের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তিনিই বান্দাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। তাই পরবর্তী আয়াতে মানুষের রিযিকের আলোচনা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

সুরা: বনী ইসরাঈল
আয়াত নং :-31

وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

(সাত) দারিদ্রের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ।৩১

তাফসীর :

টিকা:৩১) যেসব অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধেছে, এ আয়াতটি তার ভিত পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন যুগে দারিদ্র্য ভীতি শিশু হত্যা ও গর্ভপাতের কারণ হতো। আর আজ তা দুনিয়াবাসীকে তৃতীয় আর একটি কৌশল অর্থাৎ গর্ভনিরোধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাটি তাকে অন্নগ্রহণকারীদের সংখ্যা কমাবার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এমনসব গঠনমূলক কাজে নিজের শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োগ করার নির্দেশ দিচ্ছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী রিযিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ ধারাটির দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের স্বল্পতার আশঙ্কায় মানুষের বারবার সন্তান উৎপাদনের সিলসিলা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হওয়া তার বৃহত্তম ভুলগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ ধারাটি মানুষকে এ বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, রিযিক পৌঁছাবার ব্যবস্থাপনা তোমার আয়ত্বাধীন নয় বরং এটি এমন এক আল্লাহর আয়ত্বাধীন যিনি তোমাকে এ যমীনে আবাদ করেছেন। পূর্বে আগমনকারীদেরকে তিনি যেভাবে রুজি দিয়ে এসেছেন তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দেবেন। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও একথাই বলে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হতে থেকেছে ঠিক সেই পরিমাণে বরং বহু সময় তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ বেড়ে গিয়েছে। কাজেই আল্লাহর সৃষ্টি ব্যবস্থাপনায় মানুষের অযথা হস্তক্ষেপ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ শিক্ষার ফলেই কুরআন নাযিলের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন যুগে মুসলমানদের মধ্যে জন্ম শাসনের কোন ব্যাপক ভাবধারা জন্ম লাভ করতে পারেনি।

আলোচ্য আয়াতে এই নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্ত উল্লেখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। এক হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, "সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা অবশ্যই বড় কিন্তু তারপর কি? তিনি বললেন, এবং তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা"। [বুখারীঃ ৪৪৭৭]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিক দানের তোমরা কে? এটাতো একান্তভাবে আল্লাহ তাআলার কাজ। তোমাদেরকেও তো

তিনিই রিযক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছে?

এই নির্দেশ সূরা আনআম ৬:১৫১ নং আয়াতেও উল্লেখ হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাঃ) শিরকের পর যে গুনাহকে সবচেয়ে বড় গণ্য করেছেন, তা হল এই ((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)) "তোমার নিজ সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাবে।" (বুখারীঃ তাফসীর সূরা বাকারা, আদব অধ্যায়, মুসলিমঃ তাওহীদ অধ্যায়) ইদানীং সন্তান হত্যার এই মহাপাপ অতীব সুশৃঙ্খল নিয়মে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'-এর সুন্দর নামে সারা পৃথিবীতে চলছে। পুরুষরা 'উত্তম শিক্ষা ও তরবিয়ত' (বা 'ছোট পরিবার, সুখী সংসার') এর নামে এবং মহিলারা তাদের দেহের 'সুষমা' অক্ষয় রাখার জন্য ব্যাপকহারে ('আমরা দুই আমাদের দুই' শ্লোগান দিয়ে) এই অপরাধ করে চলেছে। أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ।

পূর্বের আয়াতে রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তিনি মানবসহ সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা না করে। কারণ তিনিই তোমাদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে রিযিক দিয়ে থাকেন। আমরা জানি মানুষ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে রিযিক নির্ধারণ করে রাখা হয়। সুতরাং যিনি দুনিয়াতে মানুষ প্রেরণ করবেন তিনি তার রিযিকের ব্যাবস্থা করেই প্রেরণ করবেন। দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করা শিরকের পর বড় ধরণের একটি গুনাহ বলে হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তুমি তোমার নিজ সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করো না যে, সে তোমার সাথে খাবে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৪৭৭)

অনেকে মনে করে থাকে, এটা অপরাধ হবে বাচ্চা দুনিয়াতে আসার পর হত্যা করলে। না, ছোট ও সুখী পরিবারের নামে বা অর্থ সম্পদ নেই, বেশি সন্তান হলে খাবার দেব কোথা থেকে, বা মহিলাদের সৌন্দর্য অক্ষত রাখার জন্য সন্তান কম নেয়াই হল সন্তান হত্যা করা। এসব যেকোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন এ অপরাধের শামিল হবে। এ সম্পর্কে সূরা আন'আমের ১৫১ নং আয়াতে আলোচনা রয়েছে।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

আর যিনার ধারের-কাছেও যেও না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

"যিনার কাছেও যেও না।" এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিক ভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। আয়াতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছেঃ এক, এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। কিন্তু যাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সামান্যতম অংশও বাকী আছে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলে তারা ব্যভিচারকে অন্যায় বলে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে না। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। এটা শুনে চতুর্দিক থেকে লোকেরা তার দিকে তেড়ে এসে ধমক দিল এবং চুপ করতে বলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, বস। যুবকটি বসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি এটা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করিনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তেমনিভাবে মানুষও তাদের মায়েদের জন্য সেটা পছন্দ করেনা। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করিনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

অনুরূপভাবে মানুষ তাদের মেয়েদের জন্য সেটা পছন্দ করেনা। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার বোনের জন্য সেটা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ

করিনা। তখন রাসূল বললেনঃ তদ্রুপ লোকেরাও তাদের বোনের জন্য তা পছন্দ করে না। (এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফুফু, ও খালা সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বললেন আর যুবকটি একই উত্তর দিল) এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! তার গুনাহ। ক্ষমা করে দিন, তার মনকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করুন। " বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এরপর এ যুবককে কারো প্রতি তাকাতে দেখা যেত না। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৫৬, ২৫৭]

দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে। এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোরের চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না। [মুসলিমঃ ৫৭]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারের মত অশ্লীল বেহায়াপনাপূর্ণ কাজের নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করছেন। এটি এমন একটি অপরাধ যে, অপরাধী বিবাহিত হলে ইসলামী সমাজে তার জীবিত থাকার অধিকার থাকে না। এমনকি তরবারী দিয়ে হত্যা করলেও যথেষ্ট হয় না, বরং পাথর মেরে হত্যা করতে হয় যাতে সমাজে এ শ্রেণির লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে এবং লোকেরা তা থেকে শিক্ষা নেয়। তাই এখানে ব্যভিচারের কথা বলা হয়নি, ব্যভিচারের প্রতি উৎসাহিত করে, ধাবিত করে এমন কাজ ও কথাবার্তার কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, কোমল কন্ঠে কথা বলা, মহিলাদের সাজ-সজ্জা করে বাড়ির বাইরে যাওয়া, অশ্লীল গান-বাজনা ও ভিডিও ফিল্ম ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা এটাকে فَاحِشَةً বা অশ্লীল বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ এটা শরীয়তের দিক থেকে যেমন খারাপ কাজ তেমনি মানুষের বিবেকও খারাপ বলে। এতে আল্লাহ তা'আলার হক নষ্ট হয়, মহিলার হক নষ্ট হয়, স্বামীর হক নষ্ট হয় সর্বোপরি সমাজে অশ্লীতা সৃষ্টি হয় ও মানুষের বংশনামা নষ্ট হয়। তাই আমাদের প্রত্যেককে এ অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا

আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না [১]! কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমরা তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি [২]; কিন্তু হত্যা ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে [৩]; সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই।

[১] অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা আরেক নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহর কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া লঘু অপরাধ (তিরমিযীঃ ১৩৯৫, ইবনে মাজহঃ ২৬১৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ প্রত্যেক গোনাহ আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনে-শুনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলিমকে হত্যা করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে না। [নাসায়ীঃ ৭/৮১] সুতরাং কোন মু'মিনকে হত্যা করা অন্যায়। শুধুমাত্র তিনটি কারণে অন্যায় হত্যা ন্যায়ে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে মুসলিম আল্লাহ একমাত্র

সত্যিকার মাবুদ এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়।

(এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরীআতসম্মত শাস্তি।

(দুই) সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে।

(তিন) যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা। [মুসলিমঃ ১৬৭৬]

এ তিনটি শাস্তির দাবী করার অধিকার প্রতিটি মু'মিনের তবে এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষমতা কেউ যেন নিজ হাতে নিয়ে না নেয়। বরং একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে।

দাহহাক বলেন, এটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমরা তখন মক্কায় ছিল। এটি হত্যা সংক্রান্ত নাযিল হওয়া প্রথম আয়াত। তখন মুসলিমদেরকে কাফেররা গোপনে বা প্রকাশ্যে হত্যা করছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মুশরিকদের কেউ তোমাদের হত্যা করছে বলে তোমরা তাদের পিতা, ভাই, অথবা তাদের গোত্রীয় কাউকে হত্যা করো না। যদিও তারা মুশরিক হয়। তোমাদের হত্যাকারী ছাড়া কাউকে হত্যা করো না। [ফাতহুল কাদীর]

[২] মূল শব্দ হচ্ছে, "তার অভিভাবককে আমি সুলতান দান করেছি।" এখানে সুলতান অর্থ হচ্ছে "প্রমাণ" যার ভিত্তিতে সে হত্যাকারীর উপর কিসাস দাবী করতে পারে। এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বের হয় যে, হত্যা মোকদ্দমায় নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণই এর মূল বাদীপক্ষ। তারা হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে এবং কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে। ইবন কাসীর] তবে যদি মূল অভিভাবক না থাকে, তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ কাজের দায়িত্ব নিতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

[৩] এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেয়া জায়েয নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। হত্যার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে। এগুলো সবই নিষিদ্ধ। যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে উন্মত্তের মতো অপরাধী ছাড়া অন্যদেরকেও হত্যা করা। অথবা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা। কিংবা মেরে ফেলার পর তার লাশের উপর মনের ঝাল মেটানো । অথবা রক্তপণ নেবার পর আবার তাকে হত্যা করা ইত্যাদি। [ইবন কাসীর] যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কেসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরীআতের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তার সাহায্যকারী হবেন। পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কেসাসের সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে মযলুম না হয়ে যালেম হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা এবং তার আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে যুলুম থেকে বাঁচাবে।

যায়েদ ইবন আসলাম এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, জাহেলিয়াত যুগের আরবে: সাধারণতঃ এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশী মানুষের প্রাণ সংহার করা হত। কেউ কেউ প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না, বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হত। আয়াতে মুসলিমদেরকে এরকম কিছু না করতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর]।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করছেন ইসলামী শরীয়তের বৈধ পন্থা ব্যতীত কাউকে হত্যা করতে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল সে সারা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করল। (সূরা মায়িদাহ ৫:৩২)

আর যদি মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাহলে তার ঠিকানা জাহান্নাম। (সূরা নিসা ৪:৯৩)

কাউকে হত্যা করার বৈধ পন্থাগুলো হল হত্যার বদলে হত্যা করা, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তাকে হত্যা করা এবং কেউ ইসলাম বর্জন করে মুরতাদ হলে তাকে হত্যা করা। সেটাও রাষ্ট্রপ্রধনের দায়িত্বে। উল্লিখিত বিধি-বিধানগুলো সম্পর্কে সূরা আন'আমের ১৫১ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا)

-এখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় তাহলে তার যে অভিভাবক রয়েছে তারা দায়িত্বশীল হবে। অর্থাৎ ইসলামী সরকারের ব্যবস্থাপনায় নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ হত্যা করলে হত্যাকারীকে হত্যা করতে পারবে, ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে অথবা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিতে পারবে। তিনটি বিধানেই তাদের স্বাধীনতা রয়েছে, তবে বাড়াবাড়ি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাড়াবাড়ি বলতে হত্যাও করবে আবার দিয়াতও নেবে, বা ক্ষমা করে আবার হত্যা করল বা কিসাস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি যেমন–

(১) একজনকে হত্যা করার ফলে দুইজন বা একের অধিক জনকে হত্যা করা, যদি তারা জড়িত না থাকে।
(২) একজনকে হত্যা করার ফলে একজনকেই হত্যা করা, কিন্তু যে হত্যা করেছে তার পরিবর্তে অন্যকে হত্যা করা।
(৩) একজনকে এবং যে হত্যা করেছে তাকেই হত্যা করা কিন্তু তার সাথে অতিরিক্ত আঘাত করা। এগুলো হল হত্যা করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। (আযওয়াউল বায়ান, অত্র আয়াতের তাফসীর)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. যেকোন পদ্ধতি অবলম্বন করে দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করা জঘন্য অপরাধ।
২. রিযিক দেয়ার মালিক আল্লাহ তা'আলা।
৩. যিনা-ব্যাভিচারের মত অশ্লীল কাজ করা তো দূরের কথা, এর নিকটবর্তীও হওয়া যাবে না।
৪. বৈধ কারণ ব্যতীত মানুষকে হত্যা করা যাবে না।
৫. অন্যায়ভাবে নিহত হলে কিসাস গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।
৬. কিসাস আদায়ের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার সম্পদের কাছেও যেয়ো না সৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত। আর ওয়া'দা পূর্ণ কর, ওয়া'দা সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ)

অর্থাৎ ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খাওয়ার জন্য তাদের সম্পদের নিকটে যেয়ো না। সাধারণত এ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ইয়াতীমদের দায়িত্বশীলদের দ্বারা। সূরা নিসার শুরুর দিকে উল্লেখ করা হয়েছে "ইয়াতীমদের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সাথে মিশ্রণ করে খেওনা"।

(حَتّٰي يَبْلُغَ أَشُدَّه)

অর্থাৎ ইয়াতিমরা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পদ দেখাশোনা করতে গিয়ে যদি নিজের উপার্জনে বাধা সৃষ্টি হয় তাহলে অন্যের কাজ করলে যেমন একটা পারিশ্রমিক পাওয়া যেত তেমন ন্যায্যভাবে কিছু সম্পদ খাওয়া যাবে তাতে কোন গুনাহ হবে না।

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيبًا

আর ইয়াতিমদেরকে যাচাই করবে [১] যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়; অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে [২] তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও [৩]। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংযত পরিমাণে ভোগ করে [৪]। অতঃপর তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

[১] আয়াতে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের পর্যায়ে পৌঁছে অর্থাৎ বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুরা বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, (দুই) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ। ইয়াতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তারা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার ও লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন।

[২] এ বাক্য দ্বারা কুরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 'বুদ্ধি-বিবেচনা'র সময়সীমা কি? কুরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোন কোন ফিকহবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন ইয়াতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয়সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তার তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

[৩] অর্থাৎ শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

[৪] আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন 'আস বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার কোন সম্পদ নেই। আমার তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম আছে, তার সম্পদ রয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে তুমি খেতে পার, অপব্যয় ও অপচয় না করে, তার সম্পদকে তোমার সাথে না মিশিয়ে এবং তার সম্পদের বিনিময়ে তোমার সম্পদের হেফাজত না করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৮৬, ২১৫, ২১৬, আবু দাউদঃ ২৮৭২]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যদি কেউ ফকীর হয়, সে ইয়াতীমের সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণে তা থেকে খেতে পারবে। [বুখারী: ৪৫৭৫; মুসলিম: ৩০১৯]

ইয়াতীমদের মালের ব্যাপারে অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশাদি দেওয়ার পর এ কথা বলার অর্থ হল, যতদিন পর্যন্ত ইয়াতীমের মাল তোমার কাছে ছিল, তার তুমি কিভাবে হিফাযত করেছ এবং যখন তার মাল তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ, তখন তার মালে

কোন কম-বেশী বা কোন প্রকার হেরফের করেছ কি না? সাধারণ মানুষ তোমার বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে জানতে না পারলেও মহান আল্লাহর নিকট তো কিছু গোপন নেই। যখন তোমরা তাঁর কাছে যাবে, তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের হিসাব নিবেন। এই জন্যই হাদীসে এসেছে যে, এটা বড়ই দায়িত্বের কাজ। নবী করীম (সাঃ) আবূ যার (রাঃ)-কে বললেন, "হে আবূ যার! আমি দেখছি তুমি বড়ই দুর্বল। আর আমি তোমার জন্য তা-ই পছন্দ করি, যা নিজের জন্য করি। কোন দু'জন মানুষের তুমি আমীর হয়ো না এবং ইয়াতীমের মালের দায়িত্ব গ্রহণ করো না।" (মুসলিম ১৮২৬নং)

أَشُدَّه শব্দের অর্থ:

أَشُدَّه শব্দের অর্থ হচ্ছে বালেগ হওয়া। আকেল সম্পন্ন হওয়া। যখন তার থেকে শৈশবের প্রভাব কেটে যাবে এবং সে নিজেই নিজের দায়িত্ব বুঝতে পারবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকারের কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন। অঙ্গীকার বলতে বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে অঙ্গীকার ও মানুষ পরস্পরের মাঝে যেসকল অঙ্গীকার করে থাকে সবই শামিল। উভয় প্রকার অঙ্গীকার পালন করা জরুরী, কারণ সে সম্পর্কে কিয়ামতের মাঠে জিজ্ঞেস করা হবে।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

মাপ দেয়ার সময় মাপ পূর্ণমাত্রায় করবে, আর ওজন করবে ত্রুটিহীন দাঁড়িপাল্লায়। এটাই উত্তম নীতি আর পরিণামেও তা উৎকৃষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা মেপে দেয়ার সময় পরিপূর্ণভাবে মেপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। কারণ এতেই বরকত নিহিত।

আল্লাহ তা'আলার তা'আলা বলেন:

(وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)

"ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।" (সূরা আর রহমান ৫৫:৯)

এ সম্পর্কে সূরা হুদে আলোচনা করা হয়েছে। শুয়াইব (عليه السلام)-এর জাতিকে এ অপরাধের কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

[১] আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেয়া হারাম। [ইবন কাসীর]

[২] এতে মাপ ও ওজন করা সম্পর্কে দুটি বিষয় বলা হয়েছে। (এক) এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ দুনিয়াতে এটি উত্তম হওয়া যুক্তি ও বিবেকের দাবী। (দুই) এর পরিণতি শুভ। এতে আখেরাতের পরিণতি তথা সওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার উত্তম পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই এর পরিণতি শুভ। ইবন কাসীর] দুনিয়ায় এর শুভ পরিণামের কারণ হচ্ছে এই যে, এর ফলে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জন দু'জনের উপর ভরসা করে, এর ফলে ব্যবসায়ে উন্নতি আসে এবং ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] অন্যদিকে আখেরাতে এর শুভ পরিণাম পুরোপুরি নির্ভর করে ঈমান ও আল্লাহ ভীতির উপর।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়

[১] تَطْفِيْفٌ এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে তাকে বলা হয় مُطَفِّف। [কুরতুবী] কুরআনের এই আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করার জন্য কড়া তাগিদ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ "ইনসাফ সহকারে পুরো ওজন ও পরিমাপ করো। আমি কাউকে তার সামর্থের চাইতে বেশীর জন্য দায়িত্বশীল করি না।" [সূরা আল-আন'আমঃ ১৫২] আরও বলা হয়েছেঃ "মাপার সময় পুরো মাপবে এবং সঠিক পাল্লা দিয়ে ওজন করবে।" [সূরা আল-ইসরা: ৩৫] অন্যত্র তাকীদ করা হয়েছে: "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় কম করে দিয়ো না। [সূরা আর-রহমান: ৮-৯)। শু'আইব আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের ওপর এ অপরাধের কারণে আযাব নাযিল হয় যে, তাদের মধ্যে ওজনে ও মাপে কম দেওয়ার রোগ সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং শু'আইব আলাইহিস্ সালাম এর বারবার নসীহত করা সত্ত্বেও এ সম্প্রদায়টি এ অপরাধমূলক কাজটি থেকে বিরত থাকেনি। তবে আয়াতে উল্লেখিত تطفيف শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না; বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা تطفيف এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। সুতরাং প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেয়াই যে আয়াতের উদ্দেশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জনৈক ব্যক্তিকে আসরের সালাতে না দেখে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে একটি ওজর পেশ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, طفّفت অর্থাৎ 'তুমি আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ে কমতি করেছ।' এই উক্তি উদ্ধৃত করে ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেয়া ও কম করা আছে [মুয়াত্তা মালেক: ১/১২, নং ২২] । তাছাড়া ঝগড়া-বিবাদের সময় নিজের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করার পর প্রতিপক্ষের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করার সুযোগ দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। [সা'দী]

وَيْلٌ অর্থ দুর্ভোগ বা ধবংস। তবে এখানে وَيْلٌ এর সাথে يَّوْمَئِذٍ যোগ হওয়ায় অর্থ হবে জাহান্নাম। কেননা কিয়ামতের দিন দুর্ভোগের চূড়ান্ত পর্যায় হল জাহান্নাম।

(إِذَا اكْتَالُوْا) অর্থাৎ তারা যখন মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয় তখন পরিপূর্ণভাবে মেপে নেয়। পক্ষান্তরে যখন মানুষকে মেপে দেয় তখন কম করে দেয়। এ চরিত্র ছিল শুয়াইব (আঃ)-এর জাতির। যারা এরূপ করে তাদের ধ্বংস অবধারিত, যেমন শুয়াইব (আঃ)-এর জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরিপূর্ণভাবে মেপে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ج لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

"এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না।" (সূরা আন'আম ৬: ১৫২)

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে : যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, খাদ্য সংকট ও শাসক গোষ্ঠির অত্যাচারের শিকার হবে। (ইবনু মাযাহ হা. ৫০১৯, সিলসিলা সহীহাহ হা. ১০৬)
অতএব আমাদের এ সকল অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমক দিচ্ছেন যারা ওজনে মানুষকে কম দেয়Ñ তারা কি ভয় করে না পুনরুত্থান ও আল্লাহ তা'আলার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু জ্ঞাত। কিয়ামত দিবসে মানুষ নগ্ন পায়ে উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির হবে। সেদিন মানুষ নিজের ঘামের মধ্যে নিমজ্জিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের এতো নিকটে থাকবে যে, তার দূরত্ব হবে এক মাইল বা দু মাইল। ঐ সময় সূর্যের প্রচন্ড তাপ হবে। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঘাম পৌঁছবে, আবার কারো ঘাম লাগামের মত হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম হা. ২১৯৬)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

আর সে বিষয়ের পেছনে ছুটো না, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই। কান, চোখ আর অন্তর- এগুলোর সকল বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

[১] আয়াতে উল্লেখিত وَلَاتَقفُ শব্দটির সঠিক অর্থ, পিছু নেয়া, অনুসরণ করা। [ফাতহুল কাদীর] সে অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে যে বিষয়ে তুমি জাননা সে বিষয়ের পিছু নিওনা। [ফাতহুল কাদীর] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, বলো না। অপর বর্ণনায় তিনি বলেছেন, যে বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কাউকে অভিযুক্ত করো না। কাতাদাহ বলেন, যা দেখনি তা বলো না। মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়া বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। [ইবন কাসীর] মোটকথা: যে বিষয় জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলাকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সবচেয়ে বড় গুনাহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা---যার কোন সনদ তিনি পাঠাননি, এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না। " [আল-আরাফঃ ৩৩]

অনুরূপভাবে ধারণা করে কথা বলাও এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় ধারনা করে কথা বলা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা বিবিধ ধারনা করা থেকে বেঁচে থাক; কেননা কোন কোন ধারনা করা গুনাহের পর্যায়ে পড়ে "[সূরা আল-হুজুরাতঃ ১২]

হাদীসে এসেছে, "তোমরা ধারনা করা থেকে বেঁচে থাক; কেননা ধারনা করে কথা বলা মিথ্যা কথা বলা ।"[বুখারীঃ ৫১৪৩, মুসলিমঃ ২৫৬৩]

[২] এ আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ

এক, কেয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সম্পর্কে তার মালিককে প্রশ্ন করা হবেঃ প্রশ্ন করা হবেঃ তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? প্রশ্ন করা হবেঃ তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? প্রশ্ন করা হবেঃ সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি শরীআত বিরোধী কাজ কর্ম করে থাকে, তবে এর জন্য সে ব্যক্তিকে আযাব ভোগ করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

দুই, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ সেগুলোকে প্রশ্ন করবেন। এটা হাশরের ময়দানে গুনাহগারদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছেঃ "আজ (কেয়ামতের দিন)। আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দেব। ফলে, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের" [৬৫]। অনুরূপভাবে সূরা আন-নূরে এসেছে, "যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে [২৪]।

এ ধারাটির অর্থ হচ্ছে লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধারণা ও অনুমানের পরিবর্তে "জ্ঞানের" পেছনে চলবে। ইসলামী সমাজে এ ধারাটির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে নৈতিক ব্যবস্থায়, আইনে, রাজনীতিতে, দেশ শাসনে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় তথা জীবনের সকল বিভাগে সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে। জ্ঞানের পরিবর্তে অনুমানের পেছনে চলার কারণে মানুষের জীবনে যে অসংখ্য দুষ্ট মতের সৃষ্টি হয় তা থেকে চিন্তা ও কর্মকে মুক্ত করে দেয়া

হয়েছে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কুধারণা থেকে দূরে থাকো এবং কোন ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই কোন দোষারোপ করো না। আইনের ক্ষেত্রে এ মর্মে একটি স্থায়ী মূলনীতিই স্থির করে দেয়া হয়েছে যে, নিছক সন্দেহ বশত কারো বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে নীতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার, মারধর বা জেলে আটক করা সম্পূর্ণ অবৈধ। বিজাতিদের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে এ নীতি-নির্ধারণ করা হয়েছে যে, অনুসন্ধান ছাড়া কারোর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না এবং নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোন গুজব ছড়ানোও যাবে না। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যেসব তথাকথিক জ্ঞান নিছক আন্দাজ-অনুমান এবং দীর্ঘসূত্রীতাময় ধারণা ও কল্পনা নির্ভর, সেগুলোকেও অপছন্দ করা হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধারণা, কল্পনা ও কুসংস্কারের মূল উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং ঈমানদারদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ ও রসূল প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয় মেনে নেবার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

قفا-يقفو এর অর্থ পেছনে পড়া। অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না, আন্দাজে কথা বলো না। ইবনু আব্বাস ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন: যা দেখনি বলো না, দেখেছি। যা শোননি বলো না, শুনেছি। আর যা জান না বলো না, জানি। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন: এমন কাউকে তিরস্কার করো না যার ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই। সুতরাং যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলা, যা সঠিকভাবে শোনা নেই তা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ। তা দুনিয়ার কোন ব্যাপারে হোক আর ধর্মীয় কোন ব্যাপারে হোক। ধর্মীয় ব্যাপারে আরো কঠোরভাবে নিষেধ রয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

كَفَي بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

একজন ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যতেষ্ট যে, সে যা শুনবে (যাচাই বাছাই না করে) তাই বলে বেড়ায়। (সহীহ মুসলিম হা: ৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা থেকে বিরত থাক। কারণ, কোন কোন অনুমান গুনাহের কাজ।" (সূরা হুজরাত ৪৯:১২)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক, ধারণা হচ্ছে জঘন্য মিথ্যা কথা। (সহীহ বুখারী হা: ৫১৪৩, সহীহ মুসলিম হা: ১৪১৩)

কারণ কিয়ামতের দিন মানুষের চক্ষু, কর্ণ ও অন্তরকে জিজ্ঞেস করা হবে। চক্ষুকে জিজ্ঞেস করা হবে সে কী দেখেছিল, কর্ণকে জিজ্ঞেস করা হবে সে কী শুনেছিল, আর অন্তরকে জিজ্ঞেস করা হবে সে কী চিন্তা ভাবনা করেছে। কিয়ামতের দিন এদের বাকশক্তি দেয়া হবে আর এরা তখন স্বাক্ষী দেবে। এ আয়াত থেকে অনেক বিদ্বানগণ তাকলীদ করা নিষেধ করেছেন, কারণ যিনি তাকলীদ করেন তিনি বিনা জ্ঞানে যার তাকলীদ করা হয় তার অনুসরণ করে থাকেন। অথচ যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমল করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। (আযওয়াউল বায়ান, অত্র আয়াতের তাফসীর)

অতএব কোন কিছু বলার পূর্বে আমাদের ভেবেচিন্তে বলা উচিত, যা বলছি তা কি আমি সঠিকভাবে জানি? যদি না জানা থাকে তাহলে বিরত থাকাই কল্যাণকর।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কোন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে সে বিষয়ে কথা বলা নিষেধ।
২. ধারণা করে কথা বলা একটি জঘন্যতম পাপ।
৩. চক্ষু, কর্ণ, অন্তর এদের জবান কিয়ামতের দিন খুলে দেয়া হবে আর এরা তখন সাক্ষ্য দেবে।

وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

যমীনে গর্বভরে চলাফেরা করো না, তুমি কক্ষনো যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চতায় পর্বতের ন্যায় হতেও পারবে না।

অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর যুলুম না করে। ' (মুসলিমঃ ২৮৬৫]

অন্য হাদীসে এসেছে, তোমাদের পূর্বেকার জাতিদের মধ্যে কোন এক লোক দুখানি চাদর নিয়ে গর্বভরে চলছিল। এমতাবস্থায় যমীন তাকে নিয়ে ধ্বসে গেল, সে এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে ঢুকতে থাকবে। [বুখারীঃ ৫৭৮৯, মুসলিমঃ ২০৮৮]

গর্ব-অহংকার করা একটি নিন্দনীয় চরিত্রের লক্ষণ। অহংকারীকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না, এমনকি কোন মানুষও পছন্দ করে না। তাই গর্ব-অহংকার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন: তোমরা পৃথিবীতে গর্ব-অহংকার করে চলাফেরা করো না। এই গর্ব-অহংকার করে চলাফেরা করার কারণে আল্লাহ তা'আলা কারুনকে জমিনে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ)

"অতঃপর আমি কারুনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।" (সূরা ক্বাসাস ২৮:৮১)

হাদীসে এসেছে, ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, একজন ব্যক্তি অহংকার করতঃ তার কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরত। ফলে তাকে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি সে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে জমিনের গভীরে যেতে থাকবে।" (সহীহ বুখারী হা: ৩৪৮৫)

তাই লুকমান (عليه السلام) তার ছেলেকে এহেন জঘন্য চরিত্র থেকে মুক্ত থাকার জন্য সাবধান করে বলেন: "আর তুমি অহংকারবশে মানুষকে অবহেলা কর না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংঙ্কারকারীকে ভলোবাসেন না।" (সূরা লুকমান ৩১:১৮)

সেজন্য মু'মিনের চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَي الْأَرْضِ هَوْنًا)

‘রাহ্মান’-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে” (সূরা ফুরকান ২৫:৬৩)

অতএব আল্লাহ তা‘আলার এই রাজত্বে আল্লাহ তা‘আলা কাউকে গর্ব-অহঙ্কার করে চলাফেরা করার অনুমতি দেননি। তাই এভাবে চলাফেরা করা যাবে না। বরং নম্র-ভদ্রভাবে চলাফেরা করতে হবে। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার জন্য নত হয় আল্লাহ তা‘আলা তাকে উঁচু করেন অর্থাৎ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (মিশকাত হা: ৫১১৯)

তারপর আল্লাহ তা‘আলা মানুষের দুর্বলতা তুলে ধরে বলেন: তুমি অহংকার করছ কিসের ক্ষমতায়? তুমি তো ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চতায় পাহাড়ের সমান হতে পারবে না। সুতরাং তোমার অহংকার করা শোভা পায় না। এসব আল্লাহ তা‘আলার কাছে ঘৃণিত চরিত্র ও নিন্দনীয়। তাই এসব চরিত্র থেকে বেঁচে থেকে নিজেদেরকে উত্তম চরিত্রে গঠন করা উচিত।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. গর্ব-অহংকার করা যাবে না।
২. নম্রভাবে চলাফেরা করা মু’মিনের বৈশিষ্ট্য।
৩. টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম।
৪. আল্লাহ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

এগুলোর মধ্যে যে সমস্ত বিষয় মন্দ, তোমার প্রতিপালকের নিকট তা ঘৃণিত।

অর্থাৎ উল্লেখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহর কাছে মকরূহ ও অপছন্দনীয়। উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে; যেমন- পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি। যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থাৎ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর যে কোন হুকুম অমান্য করা অপছন্দনীয় কাজ। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতে উল্লেখিত سيِّئُهٗ বাক্য অন্য কেরা’আতে! سيئة পড়া হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে, এ সবগুলোই মন্দ কাজ। আল্লাহ এগুলো অপছন্দ করেন। [ইবন কাসীর]

ذٰلِكَ مِمَّآ أَوْحٰى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا ءَاخَرَ فَتُلْقٰى فِى جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا

এসব সেই হিকমাতের অন্তর্ভুক্ত যা তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি ওয়াহী করেছেন। আল্লাহর সঙ্গে অপর কোন ইলাহ স্থির করো না, করলে তুমি নিন্দিত ও যাবতীয় কল্যাণ বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলেও উদ্দেশ্য হলো তার উম্মত। কারণ তিনি শির্ক করার অনেক উর্ধ্বে। লক্ষণীয় যে, এ আদেশ, নিষেধ ও অসিয়তের শুরু হয়েছিল শির্কের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে। শেষ করা হলো আবার সেই শির্কের নিষেধাজ্ঞা দিয়েই। এর দ্বারা এটাই বোঝানো ও এ বিষয়ে তাকীদ দেয়া উদ্দেশ্য যে, দ্বীনের মূলই হচ্ছে শির্ক থেকে দূরে থাকা। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। কেউ কেউ বলেন, প্রথম যখন শির্ক থেকে নিষেধ করা হয়েছিল তখন তার শাস্তি বলা হয়েছে যে, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বসে পড়বে, অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা এভাবে সাহায্যহীন হয়ে থাকবে। তারপর সবশেষে যখন শির্ক থেকে নিষেধ করা হয়েছে তখন তার শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, তাহলে জাহান্নামে নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে। এটা নিঃসন্দেহে আখেরাতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

তোমার রব তোমাকে অহীর মাধ্যমে যে হিকমতের কথাগুলো বলেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। আর দেখো, আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ স্থির করে নিয়ো না, অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে নিন্দিত এবং সব রকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত অবস্থায়।

আপাতদৃষ্টে এখানে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের অবস্থায় মহান আল্লাহ নিজের নবীকে সম্বোধন করে যে কথা বলেন তা আসলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলা হয়।